যুগান্তর

তারিখ 29 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

মাছুম বিল্লাহ

শিক্ষার হাল : কয়েকটি চিত্র

বাহামার রাজধানী নাসাউতে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর শিক্ষামন্ত্রীদের ১৯তম সম্মেলনে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং ইউরোপীয় অঞ্চলের মন্ত্রীদের ১৯তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৩ জুন-২০১৫। ওই সম্মেলনে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেছেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা সমতার দিক দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। বাংলাদেশের মতো একটি স্বল্পোন্নত দেশের জন্য এটি একটি বিরল অর্জন। এটি আমরাও স্বীকার করি এবং বিষয়টি নিশ্চয়ই আমাদের অবশ্যই গর্ব করার মতো। কিন্তু আমরা যদি ধীরে ধীরে শিক্ষার একটু ওপরের দিকে তাকাই তাহলে কী দেখতে পাই বা পাচ্ছি?

এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১২ লাখ ৬৮ হাজার শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে, আর দু-এক দিনের মধ্যেই কলেজে তাদের ভর্তি শুরু হবে। এখান থেকেই বেরিয়ে এসেছে কিছু তথ্য। প্রয়োজন না থাকলেও একের পর এক কলেজ অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছে ঢাকা বোর্ড। এসব কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত, এতদিন সে বিষয়টি প্রকাশে না এলেও এবার অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম চালু হওয়ায় তা স্পষ্ট হয়েছে। ঢাকা বোর্ডের অধীনে অন্তত ৩০০ কলেজ আছে, যেগুলোতে ভর্তি হতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ নেই। এমন কলেজও আছে যেখানে এবার অনলাইন এবং এসএমএস আবেদনে মাত্র চার-পাঁচজন শিক্ষার্থী পছন্দের তালিকায় প্রথমে রেখেছে। তাও হয়তো বাসার কাছে কলেজ, নয়তো বেতন কম অথবা শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে বুঝতে পারেনি বলে। ঢাকা বোর্ডে অনলাইনে ও এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন করেছে ৩ লাখ ৭২ হাজার ৮৩৪ ছাত্রছাত্রী। ঢাকা বোর্ডের ১ হাজার ২০৫টি কলেজের আসন প্রায় ৪ লাখ ৬০ হাজার। সেই হিসাবে শুধু ঢাকা বোর্ডেই শূন্য থাকবে ৮৭ হাজার ১৬৬টি আসন। শূন্য আসনের বেশিরভাগই নতুন অনুমোদন পাওয়া ৩০০ কলেজ। সারা দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১২ লাখ ৬৮ হাজার পরীক্ষার্থী পাস করলেও এইচএসসি ও সমমানে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে ১২ লাখ শিক্ষার্থী। সারা দেশের ৩ হাজার ৭৫৭টি কলেজে প্রায় সাড়ে ১৪ লাখ আসন রয়েছে। সেই হিসাবে এবার একাদশ শ্রেণীতে প্রায় ২ লাখ আসন শূন্য থাকবে। কলেজ অনুমোদন নীতিমালায় বলা হয়েছে, প্রতিটি কলেজে প্রতি শিক্ষাবর্ষে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে ২৫ শিক্ষার্থী থাকতে হবে। নইলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ওই কলেজের অনুমোদন বা স্বীকৃতি বাতিল করতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষই স্বীকার করেছে এবার ৩০০টি কলেজ তাদের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। তবে যাদের ডিগ্রি ও অনার্স আছে তারা পার পেলেও এক-তৃতীয়াংশ কলেজের অনুমোদনও বাতিল হয়ে যেতে পারে। তিন ধরনের কলেজকে সাধারণত অনুমোদন দেয়া হয়। যেমন কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত কলেজ, শুধু কলেজ এবং যারা তিনশত টাকা বন্ডে লিখিত দিয়ে জানায় যে, কখনোই তারা এমপিওভুক্তির আওতায় আসবে না। যারা এমপিওভুক্তি নেবে না সেসব কলেজ পরিদর্শনের মাধ্যমে অনুমোদন দেয় ঢাকা বোর্ড। বাকি কলেজগুলোর ক্ষেত্রে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। তাদের নির্দেশনার পরই বোর্ড অনুমোদন দেয়। দেখা যায়, বেশিরভাগ অনুমোদনই রাজনৈতিক সুপারিশে হয়। একই এলাকায় একটি কলেজ থাকার পরও আরেকটি কলেজের অনুমোদন চাওয়া হয়। সংসদ সদস্যরা ডিও লেটার পাঠান। তাই প্রয়োজন না থাকলেও মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেয়। জনসংখ্যার অনুপাতে, ভৌগোলিক অবস্থার বিবেচনায় আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন আর এজন্য দরকার রাষ্ট্রীয় বিশাল পরিকল্পনা। বর্তমানে যেটি হচ্ছে, সংসদ সদস্য যত বেশি শক্তিশালী, তিনি তার এলাকায় পার্টির বিবেচনায় দাঁড় করাচ্ছেন একটি কলেজ বা স্কুল। সেখানে স্কুলের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, একটি স্কুল থেকে বা কলেজ থেকে আর একটি স্কুল বা কলেজের দূরত্ব কতটা থাকা উচিত ইত্যাদি কোনো কিছুই বিবেচনায় না নিয়ে একটি স্কুল বা কলেজকে অনুমোদন দেয়া হচ্ছে শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায়। আবার যেখানে স্কুল বা কলেজ আসলেই প্রতিষ্ঠা করা দরকার, সেখানে হয়তো তা নেই। দেশের শিক্ষার মান নিয়ে তো অহরহই কথা হচ্ছে, সে বিষয় না হয় আলোকপাত এবার নাই করলাম।

কলেজের পরের ধাপ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী হচ্ছে তার একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনে। যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক সাপ্তাহিক টাইমস, হায়ার এডুকেশন-এর গবেষণায় শিক্ষার মান, গবেষণাসহ বিভিন্ন মানদণ্ডে ২০১৫ সালে এশিয়ার যে ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে চীনের প্রাধান্য বেশি। সেই সঙ্গে ভারতের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় জায়গা করে নিতে পেরেছে। কেবল টিএইচটির জরিপেই নয়, সাংহাইভিত্তিক একাডেমিক র‍্যাংকিং অব ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বিশ্বের ১ হাজার ২০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মান যাচাই করে যে ৫০০টি মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা দিয়েছে, তাতেও বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাঁই হয়নি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতো নয়ই, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থাই একই, অর্থাৎ মান অনেক নিচে।

এবার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র একটু দেখা যাক। শিক্ষা সচিব হঠাৎ করে রাজধানীর দুটো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। তিনি যা যা দেখলেন বিশ্ববিদ্যালয় দুটোতে, একটু আলোকপাত করা যাক। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০০, শিক্ষক পাঁচজন। এর মধ্যে আবার ৩০ শতাংশ শিক্ষক সব সময়ই অনুপস্থিত থাকেন। বাকি শিক্ষকরা বিভিন্ন বর্ষে মার্কেটিংয়ের মতো একটি আধুনিক বিষয়ে সপ্তাহে গ্রায় ৪০টি ক্লাস নেন। এসব ঘটনা ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমনকি একটি ভালোমানের স্কুলে যে শিক্ষা উপকরণ, অবকাঠামো, ল্যাবরেটরি থাকা প্রয়োজন তা-ও নেই এ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে। একেকটা খুপরির মতো শ্রেণীকক্ষ। আলো-বাতাস ঢোকার কোনো জায়গা নেই। শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে আশ্রয় নেয়া হয় নানা প্রতারণার। কম্পিউটার ল্যাবে থরে থরে সাজানো মনিটর। কিন্তু কোনো মনিটরের সঙ্গে সিপিইউ নেই। ওয়াইফাই বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সুবিধা তো নেইই। পরীক্ষার সময় নকল লিখে দেয়ালের সব জায়গা ভরা। শিক্ষা সচিব এবং ইউজিসির এক কর্মকর্তা আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে এ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই চিত্র দেখেন। তবে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরই এই হাল নয়। দেশে বেশকিছু ভালোমানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থাকার কারণে সচ্ছল পরিবারের অনেক শিক্ষার্থীই এখন পাশের দেশগুলোতে না গিয়ে দেশের এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই ভর্তি হচ্ছেন। আর এ সুযোগে সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর অতিরিক্ত ভ্যাট আদায় করার প্রস্তাব করছে। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছে। তারা বলছে শিক্ষা কোনো পণ্য নয়, অধিকার। ভ্যাট দিয়ে শিক্ষা কিনলে আর কেউ শিক্ষার্থী থাকবে না, তাদের ক্রেতা নামে চিহ্নিত করা উচিত। তাই সরকারকে উচ্চশিক্ষায় ভ্যাট আরোপের আগে নির্ধারণ করতে হবে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ালেখা করে তারা শিক্ষার্থী নয় ক্রেতা। আর এক দেশে তো দুই নিয়ম চলতে পারে না। ১০% ভ্যাট ধরা হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে ৪ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। সরকার ভ্যাট আরোপ করলে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ফি বাড়িয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই ভ্যাটের টাকা আদায় করবে। বাজেটের আগে এবং পরে যেমন পণ্যের দাম বাড়ে তেমনি শিক্ষার দাম বাড়িয়ে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, 'উচ্চমূল্যের শিক্ষা মানুষকে স্বার্থপর করে, শিক্ষিত করে না। অতএব সরকারকে বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে।

এদিকে দেশের একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যাকে নিয়ে মোটামুটি গর্ব করা যায় সেটি হচ্ছে 'বুয়েট'। গতকাল এটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কারণটি কী? শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে ক্যাম্পাসে ভাঙচুর চালিয়েছে। বুয়েটের শিক্ষার্থীরা এমনিতেই দেশের মেধাবী সন্তান, তারা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মতো রাজনীতি নিয়ে বেশি ব্যস্ত না থেকে পড়াশোনা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। তাদের কাছ থেকে আমরা এমনটি আশা করি না। আবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও কোনো ধরনের কিছু হলেই তাদের কাছে একটি সমাধান থাকে। আর সেটি হচ্ছে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা। যখন-তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে যাদের ঢাকায় বাড়ি বা আত্মীয়স্বজন নেই তাদের যে কী সমস্যা হয় তা বোধ করি বাংলাদেশের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই বুঝবেন। আমার মনে হয় শিক্ষকরা বুঝেও এ কাজটি করেন শিক্ষার্থীদের বোঝানোর জন্য যে, দেখ আমাদের হাতে কত ক্ষমতা। সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা যে কী তাতো আমরা প্রতিদিনই পত্রিকার পাতায়, টিভির পর্দায় কেউ কেউ সরাসরি প্রত্যক্ষও করছি। বিশেষ একটি ছাত্র সংগঠনের চাঁদাবাজি, শিক্ষকদের হয়রানি করা, সাধারণ শিক্ষার্থীদের হলে থাকতে না দেয়াসহ যত সব অনিয়মের খবর অহরহই দেখছি। কী হতে যাচ্ছে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যৎ? জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জুনিয়র শিক্ষার্থীরা সিনিয়র শিক্ষার্থীদের বেধড়ক মেরেছে কোনো কারণ ছাড়াই। কারণ তারা যে সরকারি দলের। যে শিক্ষার্থীরা পিটিয়েছে তারা ভালোভাবেই জানে তাদের সঙ্গে প্রশাসন আছে, সরকার আছে, রাষ্ট্রীয় সব যন্ত্র আছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এসব কি হতেই থাকবে? তাহলে বৈশ্বিক শিক্ষামণ্ডলে আমাদের স্থান কোথায় হবে?

মাছুম বিল্লাহ : *শিক্ষা গবেষক এবং সাবেক ক্যাডেট কলেজ শিক্ষক*
masumbillah65@gmail.com